ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 144-154
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.190

উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা

ড. স্বপন মাল, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.08.2025; Accepted: 24.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Looking at the history of world literature, it is seen that Sanskrit literature is the oldest literature. Vedic literature is the oldest part of Sanskrit literature. When the complete Vedic literature was divided into four parts by Acharya Vyasa, they were called Rig, Sama, Yaju and Atharva. The last part of these four Vedas is associated with the Upanishads or Vedanta literature. According to Muktikopanishad, the number of Upanishads is 108. But according to many researchers, the number of Upanishads is close to 200. However, the Upanishads on which Shankaracharya has written commentaries are considered to be the main Upanishads or main Upanishads. The number of such Upanishads is ten or, according to some opinions, eleven. In all these Upanishads, the message of world civilization, i.e. human civilization, culture, peace, love and friendship has been spread. Such rare and infallible healthy cultural thought is scarce in the world's non-Sanskrit literature. When the intellect develops through knowledge, one can then experience the truth and the untruth. Accepting the truth and rejecting the untruth, that is, the falsehood is the proper action of a wise person. Realizing the ultimate truth, the undivided, the bliss of truth, the non-dual, the supreme truth behind the truth is the real search for truth. When such knowledge is revealed in the heart, differences are eliminated, unity is felt amidst diversity, and world peace is established by awakening a sense of universal culture. All these healthy thoughts are combined in the Upanishads.

Keywords: Upanishad, Civilization, Brotherhoodness, World Culture, World Peace

সভ্যতার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিল- আমি কে? এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কার দ্বারা জীবিত আছি? আমাদের সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা কে করেন? মৃত্যুর পর কোথায় যাব? এমন নানান প্রকার ভাবনার উদ্রেক ঘটেছিল প্রাচীন মহান ভারতবর্ষের তপোবনসম সুশীতল, বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ, সমাহিত, শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে তপোমগ্ন ঋষিদের প্রশস্ত অন্তরের অন্তস্তলে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ঝংকৃত হয়েছে–

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবামঃ কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্।।[1]

বহু বর্ষকাল ব্যাপী নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফলে সেই সকল চিরন্তন প্রশ্নসমূহের সমাধানের মার্গ আবিষ্কৃত হয় কার্য-কারণতত্ত্বব্যাখ্যার মাধ্যমে। ঋষিগণ জ্ঞানচক্ষু দিয়ে যা দর্শন করেন, তা ব্যক্ত করেন শিষ্যদের কাছে। শিষ্যগণ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান শুনে শুনে মনে রাখতেন এবং জীবনে চর্চা ও চর্যার দ্বারা তা পরিপালনের চেষ্টা করতেন। যে বিদ্যা শিষ্যগণ গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে মনে রাখতেন তা শ্রুতি নামে পরিচিত। শ্রুতির অপর নাম বেদ। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদ শব্দের উৎপত্তি। যেখানে আমরা কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করতে অপারগ হই, তখন বেদের প্রামাণ্যই মননশীল দার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। বলা হয়–

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা।।

এই বেদ সৃষ্টির সময়ে এক ও অখণ্ড ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমগ্র বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন। সেই চারটি খণ্ড যথাক্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব নামে অভিহিত হয়। পুনরায় প্রতিটি বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা- সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের সংহিতা বা মন্ত্র অংশে বৈদিক দেব-দেবীদের স্তুতি, দার্শনিকতত্ত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ ও সংবাদাত্মক প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বৈদিক যাগ-যজ্ঞবিষয়ক কর্মের বিশদ ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়। আরণ্যক অংশে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অন্ত্যাংশ এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রাক্ মুহূর্তাংশের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। বেদের সর্বশেষাংশে বিদ্যমান হল উপনিষদ্। এই অংশে দার্শনিকতত্ত্বের চরমোন্মেষ ঘটেছে এবং এই কারণে উপনিষদ্ হল বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রধান চরমোৎকৃষ্ট অংশ। মূলতঃ জ্ঞান মার্গের তত্ত্বালোচনা উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও কর্মমার্গ, যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের অপূর্ব সমন্বয়সাধন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে উপনিষদ্ সাহিত্যে। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়যোগে উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ- যে বিদ্যা সংসার বাসনাকে বিশীর্ণ বা শিথীল করে, যে বিদ্যা অবিদ্যাবিনাশপূর্বক পরব্রহ্মে নিকট উপনীত করায়, যে বিদ্যা আসক্তির হেতুকে অবসন্ন করে বা নিস্তেজ করে দেয়, যে বিদ্যা সত্ত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে নিয়ে যায়, সেই বেদবিদ্যাই হল উপনিষদ্। উপনিষদ্ বেদের অন্ত্যে বা অন্তিমে অবস্থিত। সেইকারণে, উপনিষদ্ বেদের সারভাগ বা চরমাংশ এবং বেদান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। রহস্যবিদ্যা নামেও পরিচিত উপনিষদ্। মুক্তিকোপনিষদনুসারে উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি। কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতে, সর্বমোট উপনিষদের সংখ্যা প্রায় ২০০। আচার্য শঙ্কর যে দশটি বা মতান্তরে এগারোটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছেন, সেই উপনিষদ্ সমূহকে মুখ্য বা প্রধান উপনিষদ্ বলা হয়। অপরদিকে, শঙ্করাচার্য যে সমস্ত উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সেই উপনিষদ্ সমূহকে গৌণ বা অপ্রধান উপনিষদ্ বলা হয়। মুক্তিকোপনিষদ্ অনুসারে বলা হয় প্রধান উপনিষদ্ দশটি। সেখানে উদ্ঘোষিত হয়েছে –

ঈশা-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্য-তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ং ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।।

তথাপি উল্লেখনীয় যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মুখ্য না গৌণ- এ নিয়ে গবেষকমহলে বিতর্ক বিদ্যমান। কেননা, এই উপনিষদের প্রাপ্ত ভাষ্য শঙ্করাচার্য কর্তৃক বিরচিত কিনা- এ নিয়ে সন্দেহ বর্তমান। মুখ্য উপনিষদের সময়কাল নির্ধারণ করা হয় আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। তথাপি অধিকাংশ গবেষকের মতে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ মুখ্য উপনিষদের মতোই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গবেষণাপত্রে যথাক্রমে দশটি মুখ্য উপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রতিফলিত বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই সকল উপনিষদেই বিশ্বসভ্যতার তথা মানবীয় সভ্যতার, সংস্কৃতির, শান্তির, প্রেমের এবং মৈত্রীর বাণী প্রচারিত হয়েছে। এমন দুর্লভ ও অমোঘ সুস্থ সাংস্কৃতিকচিন্তা বিশ্বের সংস্কৃতভিন্ন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়টি অন্তরের আকুতি দিয়ে অনুভব করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।।

জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ হলে পরে সত্য-অসত্য বিষয় অনুভব করা যায়। সত্যবস্তুকে গ্রহণ এবং অসত্য অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুকে বর্জন করাই হল জ্ঞানীব্যক্তির উচিৎ কর্ম। সত্যের অন্তরালে পরমসত্য, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা হল প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান। এরূপ জ্ঞান অন্তরে উদ্ভাসিত হলে ভেদভাব দূরীভূত হয়, বিবিধের মাঝে ঐক্য অনুভূত হয়, বিশ্বসাংস্কৃতিক বোধ জাগরণপূর্বক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সুস্থভাবনার মেলবন্ধন ঘটেছে উপনিষদে।

ঈশাবাস্যোপনিষদ্ বা ঈশোপনিষদ্ হল শুক্লযজুর্বেদীয়বাজসনেয়ীসংহিতোপনিষদ্। ঈশা বা ঈশাবাস্য- শব্দ দিয়ে এই উপনিষদের শুভারম্ভ হওয়ার কারণে নামকরণ হয়েছে ঈশোপনিষদ্ বা ঈশাবাস্যোপনিষদ্। সমগ্র বিশ্ব একই পরমসত্তার বিবিধ রূপের দ্বারা তিনিই পরিব্যাপ্ত। তাই তাঁকে জেনে নিজের অন্তরে সঞ্চিত মলিনতার অন্ধকার দূর করে, কারও সম্পত্তিতে লোভ না করে পরমাত্মাকে পেয়ে অনন্ত সুখভোগ করা যায়। এইকারণে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে উদ্ঘোষিত হয়েছে-

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।[2]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপর্যুক্ত শ্রুতিটির অভিনব ব্যাখ্যা করে ধর্ম গ্রন্থের ততঃ কিম্ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন- ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।... তিনি ত্যাগ যাহা করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না। সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া, তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি মারামারি থামিয়া যায়। এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ রচনার জীবন নির্বাহের গোড়াকার কথা। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রের মাধ্যমেও বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই জগতে শাস্ত্রসম্মত কার্য করেই অর্থাৎ সৎ ও ন্যায়সম্মত কর্ম করেই শতবছর বাঁচতে ইচ্ছা করা উচিৎ। কেননা, কর্ম না করে কোনো মানুষ একমুহূর্তও বাঁচতে পারে না। তাই, সৎ কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম করা বাঞ্ছনীয়। যিনি বাঁচতে চান অথচ সৎকর্ম বা নিষ্কাম কর্ম করেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন এবং ফলস্বরূপ সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রটি হল-

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।[3]

ধর্ম গ্রন্থের ততঃ কিম্ প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন- কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তারপরে ব্রহ্মলাভের কথা, সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না। মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন ও সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে। পরবর্তী মন্ত্রেও বিশ্বসংস্কৃতির মূলমন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে। ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।(ঈশোপনিষদ্ - ৩)

অর্থাৎ পরলোকে যে সকল অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত লোক আছে, আত্মার স্বরূপ যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা মৃত্যুর পর সেই সকল লোকে গমন করে। এই মন্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বকবি। তিনি মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে অনবদ্য ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য মহাদেশের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন- সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে। কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করে, স্পর্ধা করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। ... এইসব আত্মম্ভরিরা আত্মহনো জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। অতএব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আত্মজ্ঞানহীন হলে চলবে না, হতে হবে

আত্মজ্ঞানযুক্ত। যেহেতু, যাঁরা কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করেন এবং যাঁরা কেবল বিদ্যার আলোচনা করেন তাঁরা অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যা- এই উভয়ের যাঁরা চর্চা বা আলোচনা করেন তাঁরাই কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যার সহায়তায় অমৃতত্ব লাভ করেন। আলোচ্য উপনিষদে ঝংকৃত হয়েছে-

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।[4]

শিক্ষার মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপর্যুক্ত শ্রুতিটির যথাযথ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে- পশ্চিম মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে, সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা। এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করার উপায়। অতএব পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন- বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ... ইত্যাদি।

কেনোপনিষদ্ বা তলবকারোপনিষদ্ সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঈশোপনিষদের মতোই এই উপনিষদেও কেন শব্দ দিয়ে সূত্রপাত। এইকারণে, আলোচ্য উপনিষদের নাম কেনোপনিষদ্। এই কেনোপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনার যথাযথ সংকেত পরিলক্ষিত হয়। যে ভাবনার সাথে মিশে যায় কবির ছন্দ, মনন, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। এমনই একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্র-

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।[5]

অর্থাৎ মানুষ যদি ইহলোকেই ব্রহ্মকে জানতে পারে তবে তার সত্য অর্থাৎ জীবনের সফলতা, পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। অপরদিকে, যদি এই আত্মাকে জানিতে না পারে তবে তার বিনাশ হয় অর্থাৎ সে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে সুখ-দুঃখ, জরা-মৃত্যুর অধীন হয়। অতএব, জ্ঞানীগণ সর্বভূতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে এই প্রাকৃত জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে অমৃতত্ব লাভ করেন। বিশ্ববোধ প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহতী উপনিষদ্ বাণীর অকৃত্রিম বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে- এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ- কাল্পনিকতা নয়।

কঠোপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত একখানি মহতী উপনিষদ্। কঠ নামক একজন ঋষি বেদের এই অংশের আচার্য, সেই কারণে এই অংশটির নাম কাঠক। সংশ্লিষ্ট উপনিষদের নাম কঠোপনিষদ্। এই উপনিষদেই সেই বিখ্যাত যম-নচিকেতা সংবাদ চিত্রিত হয়েছে। বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য, শ্রেয় ও প্রেয়ের চিরকালীন দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যম নচিকেতাকে বলেছেন-

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।[6]

যম বললেন- শ্রেয়োমার্গ প্রেয়োমার্গ থেকে ভিন্ন, তেমনি প্রেয়োমার্গ শ্রেয়োমার্গ থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদক এরা উভয়েই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁর মঙ্গল হয়। অপরদিকে যিনি প্রেয়োমার্গকেই গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হন। শ্রেয় এবং প্রেয় মানুষকে সম্মিলিতভাবে আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উভয়কে যথার্থভাবে পরীক্ষা করে পৃথক্ করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তমরূপে গণ্য করে তাকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু, যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীর ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রিয় পশু-পুত্রাদিরই গ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য মন্ত্রদ্বয়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে। তাঁর মতে, নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত

তাহলে এসব কথার অর্থ থাকতো না। সংগতভাবেই তিনি বলেছেন যে, যে জন জ্ঞানবিমুখ, আত্মমগ্ন সেজন বৃহৎ জগৎ থেকে কখনো আনন্দে বাঁচতে পারে না। যিনি সর্বভূতকে নিজ আত্মাতে এবং আত্মাতে নিজেকে দেখেন তিনিই প্রকৃতজ্ঞানী। তাঁর দ্বারা নির্বাচিত মার্গই শ্রেয়মার্গ। এই মার্গই সবার অনুসরণীয়। কারণ, শ্রেয়মার্গানুসরণের ফলে উপলব্ধি হয় সৎ, চিৎ, আনন্দময় পরব্রহ্মের সনাতন, শাশ্বত ও চিরন্তনরূপ। উপলব্ধি হয় যে, তিনিই সর্বকালীন নিত্য ও বাকি সমস্ত কিছুই অনিত্য বা মিথ্যা। এরূপ মতবাদের সমর্থন মেলে অপর একটি মন্ত্রে। সেটি হল-

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।[7]

এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না। এই আত্মা কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন হয় নাই। কোনো কিছু আত্মা থেকে উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ বা চিরবিদ্যমান। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন অমূল্য বচন মানুষের অন্তরকে চিরকাল নাড়া দিয়ে এসেছে, জাগ্রত করেছে মানুষের অন্তরের মনুষ্যত্ববোধকে এবং আন্দোলিত করেছে বিশ্বসভ্যতার মনস্তরঙ্গকে। স্পর্শ করেছে রবীন্দ্রনাথের মতো মহান ঋষিকবির অন্তরের অন্তস্তলকে। তিনি শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার স্বভাবকে লাভ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন, অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়। কেন না, সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর। আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে না জন্মায় না মরে। আত্মার প্রকাশ প্রবন্ধেও কবি বলেছেন, আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে। আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে। যাঁরা সাধু পুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি না- তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ। সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। জীবনকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হলে আপনার কর্তব্য-কর্ম সঠিকভাবে জানতে হবে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে, ক্ষুরের ধারার মতো শাণিত দুর্গম ও দুরত্যয় পথ অতিক্রম করে মূল গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। সেইকারণে আলোচ্য উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে-

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি ... ।[8]

এবং

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।[9]

অথর্ববেদের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি উপনিষদ্ হল প্রশ্নোপনিষদ্। ভারদ্বাজ প্রভৃতি শিষ্যগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু আচার্য পিপ্পলাদকে ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নোপনিষদ্ বিবৃত করেন গুরু পিপ্পলাদ। অন্যান্য উপনিষদের মতোই এখানেও বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরমসত্যের প্রাকৃত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। তপস্যা থেকেই এই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়েছে এবং তপস্যাই দুঃখের কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে উক্ত উপনিষদে। যাঁদের মধ্যে তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁদের মধ্যে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বচনানুসারে বলা যায়, বিশ্ব হতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হতে আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করলাম কিনা, অভয়লাভ করলাম কিনা, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হল কিনা ... এই অনুধাবন করলে আমরা যথার্থভাবে দেখব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিল জগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখেছি। সমভাবনার প্রকাশ অনুভূত হয় আলোচ্য উপনিষদে-

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ ইতি।।[10]

বিশ্বের সকল চরাচর বস্তুতে সেই এক অক্ষর পরমাত্মা বিরাজমান এবং এক পরমাত্মাও সর্বভূতে বিরাজিত। এইভাবে সমদৃষ্টিতে জগৎকে অনুভব করলে দুঃখ-জরাগ্রস্ত সংসারী মানুষের শোক-মোহ দূরীভূত হয়ে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে, অর্থাৎ পার্সোনালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়, মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি।।[11]

রথনাভিতে যেরূপ অরসমূহ অন্তর্নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপ কলাসমূহ পুরুষে অন্তর্নিহিত এবং আশ্রিত আছে। পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত কলাসমূহ থাকতে পারে না। সুতরাং পুরুষ যদি সত্যস্বরূপ হন তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত কলাসমূহ মিথ্যা-মায়া-মরীচিকা হতে পারে না।

অথর্ববেদের অন্তর্গত অন্যতম একটি প্রখ্যাত উপনিষদ্ হল মুণ্ডকোপনিষদ্। বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার মূলবাণী এই উপনিষদের বহু মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এমনই এক মন্ত্র-

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।[12]

অর্থাৎ ওঁকার ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। কবিগুরু ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম প্রবন্ধে আলোচ্য শ্রুতিটির অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন- যখন শুভ্র সবল তনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু ও হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্যনিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা। ... প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এইরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। ... সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্যযুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সংস্কৃতপ্রেমী বিশ্বকবির অমোঘ লেখনীতে বারবার মুণ্ডকোপনিষদের বহু মন্ত্র আবর্তিত হয়েছে। বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যময় প্রাঙ্গনে ও রবীন্দ্রসাহিত্যে এই উপনিষদের একাধিক মন্ত্র এবং মন্ত্রাংশ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য একটি মন্ত্র-

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।।[13]

অর্থাৎ হৃদাকাশস্থিত আত্মা মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা। তিনি বুদ্ধিকে হৃৎপদ্মাকাশে স্থাপিত করে এই অন্ন-পরিপুষ্ট দেহে অবস্থিত আছেন। যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে আত্মাতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পান, তাঁকে বিবেকিগণ সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র-

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।।[14]

অর্থাৎ সত্যই জয়ী হয়, মিথ্যা নয়। সত্যের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত, সেখানে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে আস্তীর্ণ। এমন অপূর্ব বাণীর মহাসঙ্গম, এমন সর্বকালীন চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতিফলন উপনিষদ্ সাহিত্যে পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্গত বারোটি শ্রুতিবিশিষ্ট অতি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রধান উপনিষদ্। মাণ্ডূক্যোপনিষদের অতি প্রসিদ্ধ একটি মন্ত্র-

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।
অদৃশামব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।।[15]

অর্থাৎ ইনি বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা নন, অন্তর্বিষয়ের জ্ঞাতাও নন, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী নন, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নন, সর্বজ্ঞ নন, অচৈতন্য নন। ইনি দৃষ্টির অগোচর, লৌকিক ব্যবহারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অনুমানের অযোগ্য, মনের অগোচর, প্রমাণ বহির্ভূত। কেবলমাত্র আত্মারূপে ইনি অনুভবযোগ্য, জগৎ-চরাচর হইতে ভিন্ন, শান্ত, শিব ও অদ্বৈত। ইহাকে চতুর্থ বা তুরীয় বলা হয়। ইনিই আত্মা এঁনাকে জানতে হবে। দুঃখ প্রবন্ধে কবিগুরু বলেছেন- উপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এইসমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে। ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন।

একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং। শান্তং- আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না। এই যে চঞ্চল বিশ্ব জগৎ কেবলই ঘুরিতেছে ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপ আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলেই তিনি শান্ত। শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারের চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই। সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন-পরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে। সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অপর প্রবন্ধ শান্তং শিবমদ্বৈতম্- এ তিনি বলেছেন, প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্। তারপরে অদ্বৈতম্। এখানেই সমাপ্তি। ... মঙ্গল কর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, ... তখনই নম্রতা দ্বারা, ক্ষমার দ্বারা, করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান।

শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী- এই তিনটি অধ্যায়যুক্ত তৈত্তিরীয়োপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শাখার অন্তর্গত। আলোচ্য উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতিভাবনার মূলবিষয়টি সুন্দরভাবে স্ফটিকীকৃত হয়েছে। বেদশিক্ষাসমাপনান্তে আচার্য তথা গুরু তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপদেশ দিয়েছেন-

> বেদমনুচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি- সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।।[16]

সত্য কথা বলবে। ধর্মাচরণ করবে। বিদ্যা নিষ্ক্রয়ের জন্য আচার্যের নিমিত্ত ধন আহরণ করে তা দক্ষিণাস্বরূপ দিবে। গার্হস্থে প্রবেশ করে সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না। আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হবে। উন্নতিলাভের জন্য মঙ্গলকর্মে প্রমাদগ্রস্ত হবে না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হবে না।

> দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নেতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নেতরাণি।।[17]

মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপর্যুক্ত অংশটি সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্র বলে- অতিথিদেবো ভব। কেননা, আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে, তার ঐশ্বর্যের সঙ্কোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। ...এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব- অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আলোচ্য উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রুতিতেও মানুষের ধর্ম কেমন হওয়া উচিৎ, সে বিষয়ে সতর্কবাণী করা হয়েছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,[18] রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।[19] এবং আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিশংবিশন্তীতি।[20]- এই ঔপনিষদিক সুমহতী বাণীর মাধ্যমে জলে-স্থলে-বনতলে আনন্দানুভূতির তথা আনন্দধারা প্রবাহিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। সঞ্চয় গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মের নবযুগ প্রবন্ধে কবিগুরু সমানানুভূতি প্রকাশ করেছেন, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? ছিন্নপত্রাবলীতে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে ব্যক্ত হয়েছে- জগতের ভিতরকার একটা আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ

যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)- তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে আনন্দাদ্ধ্যেব-অভিসংবিশন্তি। একথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় শাখার দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ঐতরেয় উপনিষদ্ নামে পরিচিত। এই উপনিষদে তিনটি অধ্যায় এবং সর্বসমেত পাঁচটি খণ্ড বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মবৃত্তান্ত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। বিবর্তনবাদী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ঐতরেয় উপনিষদের বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, বিশ্বসংস্কৃতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সর্বত্র একত্ব উপলব্ধি বা সমানানুভূতি। এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিফলন বিদ্যমান আলোচ্য উপনিষদে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্র- এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্রঃ এষঃ প্রজাপতিঃ এতে সর্বে দেবাঃ ইমানি চ পঞ্চভূতানি- পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চেতরাণি চ- অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ- অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তীনঃ যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্- সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।[21] অন্তিমাংশে যে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম- বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে সেই অংশটি মহাবাক্যরূপে উপনিষদ্ শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ, ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূতাত্মক তত্ত্বসমূহ প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মদ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত অথবা এই সমস্তই তাঁর সত্তাই সত্তাবান। ব্রহ্মসত্তা থেকে স্বতন্ত্র বা তাঁর বাইরে কোনো সত্তা নাই। ব্রহ্মাই নেতা আর সমস্তই তাঁর অধীন। প্রজ্ঞাই এঁদের প্রতিষ্ঠা- ব্রহ্মের জ্ঞানেই এদের স্থিতি। ভূপ্রভৃতি লোকও প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানে স্থিত, তাঁর সত্তাই সত্তাবান। এই কারণে প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। সুতরাং, বিশ্বের প্রতিটি পদার্থবিষয়ে যিনি যথার্থ জ্ঞানবান তিনি দুঃখমিশ্রিত পদার্থে আকৃষ্ট হন না। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরমানন্দপ্রাপ্ত হন। সেইকারণে প্রজ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ঋষি শ্বেতাশ্বতর এই উপনিষদের প্রবক্তা। এই উপনিষদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতর শব্দের অর্থ সংযতেন্দ্রিয়। ইতিপূর্বে ভূমিকাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কিনা- এই নিয়ে সংশয় থাকায় অনেকে একে প্রধান বা মুখ্য উপনিষদ্রূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তথাপি অনেক গবেষক একে মুখ্য উপনিষদ্রূপে স্বীকার করেছেন। এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বিশ্বসংস্কৃতিচিন্তনের বিষয় অনেক মন্ত্রে সুন্দরভাবে উপমাদ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধের তথা বিশ্বৈকত্ববোধের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্রে ঋষির দ্বারা উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে-

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।[22]
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।[23]

হে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠিত দেবতাগণ, তোমাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা চিরন্তন ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত করছি। আমার এই স্তুতিগান সাধুলোকদের পথে বিবিধভাবে বিস্তারলাভ করুক। যাঁরা দিব্যস্থান অধিকার করে আছেন সেই বিশ্বদেবগণ আপনারা শ্রবণ করুন। অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ মহান পুরুষকে আমি জানি। তাঁকে জেনেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। পরমপদপ্রাপ্তির অন্য কোনো পথ নাই। কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের কবিতায় ঘোষণা করেছেন-

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীলমহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রিতটে-
বলেছে জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র,
বলেছে দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের আবির্ভাব।

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি কবিতাতেও কবিগুরু রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে -

অমৃতের পুত্র মোরা কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অন্তিম মন্ত্রেও ঝংকৃত হয়েছে যে, গুরুর প্রতি এবং ইষ্টবস্তুর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকলে উপলব্ধ বিদ্যা প্রকাশিত হয় এবং অন্তরাত্মা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। প্রাসঙ্গিক মন্ত্রটি হল–

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।[24]

বৈশম্পায়নের শিষ্য তাণ্ড্য সামবেদের এক শাখার আচার্য। এই শাখার অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য নামে পরিচিত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তিম আটটি অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্। যাঁরা ছন্দঃ বা বেদগান করতেন সেই সামবেদীগণ ছন্দোগ। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে কর্মাঙ্গ উপাসনার বর্ণনা এবং ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত প্রকৃত ব্রহ্মোপদেশ বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। এই উপনিষদের বিস্তৃতি বাহুল্যের কারণে নির্বাচিত কয়েকটি অংশ থেকে রবীন্দ্রালোকে বিশ্বসংস্কৃতি বিষয়কতত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যকাম-জাবালা সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে কবিগুরু ব্রাহ্মণ কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন–

ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে কহিলেন তিনি সত্যকাম,
বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে–
গোত্র তব নাহি জানি।

অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে নাম, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় কোনো কিছুই বাধা নয়– এমন সত্য বাণী সেকাল-একাল উভয়ত্রই সত্য। এইসব বাধা হলে বিশ্বসংস্কৃতির যথাযথ পরিস্ফুরণ কখনই সম্ভব হয় না। এই মহতী চিরন্তন শাশ্বতবাণী যুগেযুগে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে এসেছেন। কোনো বস্তুজনিত সাময়িক সুখই মানবজীবনের পরম সুখ নয়। যা ভূমা অর্থাৎ মহান, সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাই সুখ। যাতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বিভাগ আছে তা অল্প। অল্পে সুখ নেই। ভূমাই সুখ, ভূমাকে জানবার নিমিত্ত ইচ্ছা করতে হবে। হে ভগবান্, আমি ভূমাকে জানতে ইচ্ছা করি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি।[25] শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার অন্তর্গত ভূমা প্রবন্ধে কবিগুরু উল্লেখ করেছেন– টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো না কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আত্মা বলতে পাড়ে আমার সব পাওয়া হল। অতএব যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিতে নয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তিম চতুর্দশ খণ্ড। ষষ্ঠাধ্যায়যুক্ত বৃহদাকারবিশিষ্ট এই উপনিষদে বিভিন্ন আখ্যানের উল্লেখও আছে। এই বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই বিখ্যাত মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে–

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।[26] অর্থাৎ অসৎ থেকে আমাকে সতে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। অপর একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র– তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।[27] এই আত্মতত্ত্ব পুত্র থেকে প্রিয়তর, বিত্ত থেকে প্রিয়তর, অপর সকল থেকেই প্রিয়তর। যেহেতু এই যে আত্মা ইনি অন্তরতর। বিশ্বকবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে বলেছেন–

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,

আত্মার অন্তরতর, তদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সকল পার্থিব সম্পত্তি উৎসর্গ করে গৃহত্যাগ করতে চাইছেন। তখন মৈত্রেয়ী এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্বামীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা চিরকাল বিশ্ববাসীর অন্তরে জাগরুক। নির্বাচিত মন্ত্রাংশটি হল–

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।
সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তমেব মে ব্রূহীতি।[28] শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের অমৃত কবিতায় ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন–

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন–
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বল।

অপর একটি মন্ত্র-

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।[29]

ধর্ম গ্রন্থের প্রাচীন ভারতের একঃ প্রবন্ধে কবিগুরু উল্লেখ করেছেন– খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে, খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে, তেমনি খণ্ডতার মধ্যে মৃত্যু, শান্তি সেই একের মধ্যে। ...মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতই কখনো জানিয়া কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে।

উপনিষদ্ সাহিত্য এমনই এক অমোঘ সাহিত্য ও এমনই এক অমৃততুল্য সাহিত্য যে এই সাহিত্য অত্যন্ত নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাঠ করে বিশ্বের বিখ্যাত শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্সস্যুলার, উইন্টারনিৎজ প্রমুখ মনীষীগণ এই সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান মনীষীগণ নিজেদের জীবন চর্চা ও চর্যায় উপনিষদের বাণীকে মহৌষধির মতো প্রয়োগ করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি গৃহকোণে, প্রতিটি মানুষের মনে উপনিষদের বীজ উপ্ত করেছেন। তাঁরা তথাকথিত কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম প্রচার করেন নাই, তাঁরা চেয়েছেন উপনিষদের বাণীকে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষের ধর্ম তথা বিশ্বমানবতাবাদের বিকাশ ঘটাতে। কেননা, তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটলেই বিশ্বে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন হবে এবং হিংসা-যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলার উচ্ছেদ হলে বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধ, মৈত্রীভাব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং, আমরা আশা করি বিশ্বের প্রতিটি অমৃতের সন্তান ঔপনিষদিক বাণীর মর্মোপলব্ধি করে অসৎ থেকে সতের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মৃত্যুর থেকে অমৃতের দিকে অগ্রসর হবে।

তথ্যসূত্র:

[1] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-১/১

[2] ঈশোপনিষদ্ - ১

[3] তদেব - ২

[4] তদেব - ১১

[5] কেনোপনিষদ্ – ২/৫

[6] কঠোপনিষদ্ – ১/১/১-২

[7] তদেব – ১/২/১৮

[8] তদেব – ১/৩/৩

[9] তদেব - ১/৩/১৪

[10] প্রশ্নোপনিষদ্ – ৪/১১

[11] তদেব – ৬/৬

[12] মুণ্ডকোপনিষদ্ – ২/২/৪

[13] তদেব – ২/২/৮

[14] তদেব – ৩/১/৬

[15] মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ - ৭

[16] তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, শীক্ষাবল্লী, ১১/১

[17] তদেব, শীক্ষাবল্লী, ১১/২

[18] তদেব, শীক্ষাবল্লী, ১১/১

[19] তদেব, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৭/২

[20] তদেব, ভৃগুবল্লী, ৬/১

[21] ঐতরেয়োপনিষদ্ – ৩/১/৩

[22] শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ – ২/৫

[23] তদেব – ৩/৮

[24] তদেব – ৬/২৩

[25] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ – ৬/২৩/১

[26] তদেব – ১/৩/২৮

[27] তদেব – ১/৪/৮

[28] তদেব – ২/৪/২-৩

[29] তদেব -৪/৪/১৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১।উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ)। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
২।গম্ভীরানন্দ, স্বামী। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩।
৩।গোস্বামী, সুবুদ্ধিচরণ। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতচর্চা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯।
৪।ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
৫।দত্ত, ভবতোষ। ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৬।
৬। ভট্টচার্য, সুখময়। সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪।